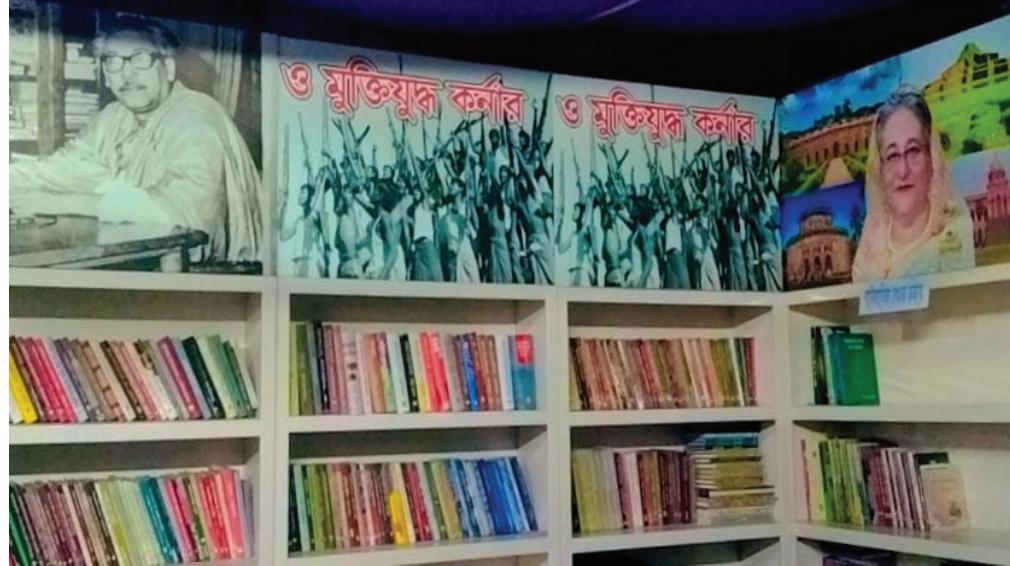


“জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন- বই, বই
এবং বই।”
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (রহ.)



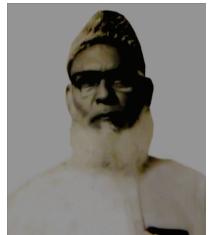
“বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে
দেয়া সাঁকো।”
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পহেলা বৈশাখ, ১৪৩১ | ১৪ এপ্রিল ২০২৪ | ৪ শাওয়াল, ১৪৪৫ | ১ বর্ষ ০১ সংখ্যা | শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা



আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরি

মো: আজমল হোসেন খান | রীনা পারভীন



আমীর আলী খান
কর্মসূল শিক্ষার জীবনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন বরিশাল জিলা স্কুল থেকে প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাস করেন।

আমীর আলী খান একজন শিক্ষানুরাগী এবং সমাজসেবী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বরিশালের নব আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হালিমা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক পদে এবং শ্রীনী চৈতন্য গোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, নূরিয়া মদ্দাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় এবং এ.কে. ইনসিটিউশন-এর সহ-সভাপত্রির পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া বরিশাল বেলতলা মোহাম্মদিয়া মদ্দাসা, সাগরদী মদ্দাসা, বরিশাল আঙ্গুমান হোমায়েতে ইসলাম-এর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থেকে সুনামের সঙ্গে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এর পাশাপাশি তিনি বরিশালের নামকরা মসজিদের সাধারণ সম্পাদক পদে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে হাজী ওমর শাহ মসজিদ, কসাই মসজিদ, বরিশাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ-এর সদস্য, কাউন্সিল এবং কমিশনার পদে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতায় তিনি ছিলেন অগ্রগামী। আমীর আলী খান ছিলেন সত্যিকারের একজন দেশপ্রেমিক।

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হককে তিনি তাঁর বাবার মতো শুন্দি করতেন। শেরেবাংলা সম্পর্কে বহু কাহিনী তিনি লিখে রেখেছেন এবং মানুষের মধ্যে তাঁর সফলতার কথা প্রচার করে গেছেন।

যেমন ছিল তাঁর জামের কদর, তেমন ছিল তাঁর সঙ্গীতের প্রতি দুর্বলতা। হয়তো বা সেটা ছিল অনেকেরই অজানা। ‘হিজ মাস্টার ভয়েস’-এর রেকর্ড প্লেয়ারে তিনি গান শুনতেন। মরহুম আমীর আলী খান ভারতের বিশিষ্ট গায়ক তালাত মাহমুদ-এর একজন ভক্ত ছিলেন।

আনুমানিক ৮৫ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন তিনি। তিনি ৭

[পৃষ্ঠা: ৩ কলাম ৩]

আ মা র জী বনে র গ ল্ল লুৎফুন নাহার

প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরির উদ্যোগদের যারা আমাকে লেখার জন্য একটা সুযোগ করে দিয়েছেন। এই লাইব্রেরি যাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত তিনি বরিশালের বনেদী পরিবারের স্বামৰণ্য এক কৃতি সত্ত্বান, একজন সমাজসেবক এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিবিড়ভাবে জড়িত থেকে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। তাঁর নাম মরহুম আমীর আলী খান, যার নামে বরিশালের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি এলাকার নামকরণ করা হয়েছে আমীর কুটির।

আমার ছেটবেলার কথা দিয়ে এ লেখা শুরু করছি। ছেটবেলা থেকেই আমার নতুন কিছু শেখার আগ্রহ ছিল।

আগের দিনে মা, খালা, চাচি সবাই সেলাই এবং উলের কাজ করে অবসর সময় কাটাতেন। বিভিন্ন ডিজাইনের ছেট ও বড়দের জন্য জামা, পায়জামা, অন্যান্য কাপড় সেলাই করায় আমার আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। মা ও

বড় বোনের কাছে আমার সেলাইয়ের হাতেখড়ি। আমার জীবনে বড় বোন নূরজাহান বেগমের অবদান অপরিসীম।

ছেট বোন মাঝু আর আমি ছিলাম খেলার সারী। নূরজাহান আপা সব কাজে উৎসাহ যুগিয়ে আমাকে অনেক খলী করেছেন। সেলাই করার পাশাপাশি আমি মাকে রাখ্যাঘরে সাহায্য করতে গিয়ে নিজে রান্না করার চেষ্টা করে যেতাম।

এভাবে রান্না করাও আমার আরেকটি স্থ হয়ে গেল। আমার হাতের আচার থেকে পাড়ার ছেলেমেয়ে আর স্কুলের বাঙাবীদের যে কোনো সময় আমাদের বাসায় হামলার স্মৃতি এখনও মনে পড়ে। সেসব দিন আজ হারিয়ে গেছে!

পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে আমার সখের ভুবনে আমি যেন এক সুখ পাখির মতোই উড়ে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু এইচেসসি পড়া শেষ না হতেই আমার বিয়ের বাজনা বেজে উঠলো। বিয়ের পর শুরু হলো নতুন জীবন, এক নতুন অধ্যায়। আমার বাবা মরহুম মনসুর আহমেদ এবং

[পৃষ্ঠা: ৩ কলাম ১]

শুভেচ্ছা বাণী

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি অত্যন্ত আনন্দিত একথা জেনে যে, ‘আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরি’র পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো একটি যান্মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। পত্রিকা প্রকাশের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকুক- এ আমার প্রত্যাশা।

রেজিনা আখতার লাইজু

সভাপতি

আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরি।

স্মৃতি বিজড়িত কমলা সার্কাস ফজিলাতুন নেসা হেলেন



বাহিরে টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ঘুম ঘুম চোখে মোবাইলে শ্রীকান্তের গান শুনছিলাম- ‘আমার সারাটা দিন মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি তোমাকে দিলাম, শুধু শ্রাবণ সন্ধ্যাটুকু তোমার কাছে চেয়ে নিলাম....’

হঠাতে অন্য মোবাইলটি বেজে উঠলো.. ‘তোমার মামা বাড়ি থেকে ম্যাগাজিন বের হচ্ছে। শুনেছ নাকি?’ ‘না তো!’ ‘কোনো স্মৃতি কথা আছে? লেখা দেবে নাকি?’

‘দেব না মানে?’

মামা বাড়ি বলে কথা। আমার জন্ম আর বেড়ে ওঠা ওখানেই। কত মজার মজার স্মৃতি ওখানে। সবচেয়ে মজার স্মৃতি হলো কমলা সার্কাস। যেমন আমার মাথায় আছে, ঠিক তেমনি আমি লিখব। সার্কাস, সার্কাস, চালিতেছে কমলা সার্কাস। আসুন, আসুন, সপরিবারে। সন্ধ্যা সাটো থেকে রাত বারোটা। স্থান পরেশ সাগরের মাঠ। দিনভর বরিশাল শহরে এমনই মাইকিং চলতো। কান ঝালাপালা হয়ে যেত শহরবাসীর।

বিরাট এলাকা জুড়ে প্যান্ডেল। চারদিকে লাল কমলা রংয়ের মোটা ক্যানভাসের বেষ্টনী। উপরে আকাশ জোড়া সামিয়ানা। নিরালায় রাখা আছে হাতি, ঘোড়া, বাঘ, বানর। হাইচই কাণ্ড! আরো ছিল কমলা সুন্দরীর বিভিন্ন পোজের ছবি। এসব অবশ্য বাহিরে লাগানো পোস্টারে। উঠঃঃ কি যে আকর্ষণ ছিল। মজাই মজা, আর ওসব দেখতে গিয়ে মধ্যে ভাঙা শামুকে আমার ডান পায়ের পাতা কেটে গেল। কত যে রক্ত পড়েছিল তা মনে হলে আমার এখনো বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। অজু করতে গেলো এখনো হাতে লাগে। প্যান্ডেলের কিছু দূরে ছিল আনসারদের ক্যাম্প।

সার্কাসের সুরক্ষার জন্য ছিল এর অবস্থান। বড় বড় ইটের চুলোতে বিরাট বিরাট হাঁড়ি। ভাত ফুটেছে টগবগ। এসব আনসারদের খাবার ব্যবস্থা। কাটা ঢ্রামের উপর লাইন দেয়া বড় বড় সাজি। রান্না করা ভাত ওই সাজিতে ঢালা হচ্ছে। আনসারদের শিং মাছ দিয়ে লাউ তরকারি রান্না আর পাঁচফোড়নের সভারের ঘন ডাল যারা একবার খেয়েছে, তারা জীবনেও ওই স্বাদ ভুলতে পারবে না। যতদিন কমলা সার্কাস, ততদিন আনসার ক্যাম্প থাকত।

ক্যাম্পের পাশ দিয়ে আধা পাকা রাস্তা। তার ও'পাশে দু'টি স্কুল ছিল। একটি পাঠশালা। অন্যটি জুনিয়র মদ্দাসা। বর্তমানে এটি হালিমা খাতুন গার্লস হাই স্কুল। আমি ওই স্কুলের ছাত্রী ছিলাম। পাঠশালাটির অবস্থা বড়ই করণ ছিল। গোটা দশেক বাঁশের উপর জুরুর হয়ে উপুড় হয়ে ছিল। ঈষৎ কুঁজো হয়ে ঢুকতে হতো ঝালসে। টিফিনের ফাঁকে দুই স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী লুকিয়ে সার্কাসের হাতি আর ঘোড়া দেখতে যেত, আমিও গিয়েছি। তবে দেখা অবশ্য মেলেনি কখনও। পশ্চাতে কর্তৃপক্ষ আটকা ছিল। আর সুন্দরী কমলা, সাজঘর ওসব থাকতো খুবই কঠোর পাহারায়। তবুও আমাদের উৎসাহের কর্মত ছিল না। অবশ্যে আনসারদের রান্নার সুস্থান নিয়ে আমরা ফিরে আসতাম।

[পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ১]

আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরির ইতিকথা

আফিফা খানম মগি

বরিশাল শহরের প্রাণকেন্দ্র বটতলা এলাকায় ২০১৭ সালে বইপ্রেমীদের জন্য আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরির নামে একটি পাঠগার গড়ে উঠেছে—যা অত্র এলাকার পাঠকদের জন্য একধাপ সুবিধা বাঢ়িয়ে দিয়েছে। আমীর আলী খান ছিলেন এলাকার তথা বরিশাল শহরে একজন সুপরিচিত সমাজসেবক এবং নিবেদিত ত্যাগী মানুষ। তাই নামে পারিবারিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরি।

মুজিব কর্ণারের পাশাপাশি, পারিবারিক কর্ণার, হোটদের কর্ণার, সাইপ্স ফিকশন কর্ণারসহ বিভিন্ন ধরনের বই, যেমন: ধর্মীয় বই বিভিন্ন তাফসীর, ইংরেজি সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদি বই দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে লাইব্রেরিটি। এখানে প্রতিদিন নিয়মিত পাঠকের সমাবেশ হয় এবং পাঠকদের পদচারণায় লাইব্রেরিটি মুখরিত হয়ে ওঠে। পড়ার পাশাপাশি গ্রাহারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন: ছেটদের হাতের লেখা প্রতিযোগীতা, বৃক্ষ প্রদান, বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়—যা তাদের মাঝে উদ্বীপনা সৃষ্টি করে। এখানে একটি হোয়াইট বোর্ডেও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেখানে প্রতি সপ্তাহে একটি করে হাসিস/মনীবিদের বাণী লিখে দেয়া হয়, যা লাইব্রেরির জন্য একটি ব্যক্তিগত অলংকরণ।

আগামী ডিজিটাল বিশ্ব তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় সামনে রেখে আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরির পাশাপাশি আমীর আলী খান ডিজিটাল লাইব্রেরিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি ২০২১ সালে যাত্রা শুরু করে। ইতিপূর্বে ডিজিটাল লাইব্রেরিতে বিনামূল্যে ৬০ জন শিক্ষিত অসহায় ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা শিক্ষার পাশাপাশি কোন চাকরির ক্ষেত্রে কম্পিউটারের দক্ষতা নিয়ে যেতে পারে সফলতার সঙ্গে। বর্তমান সরকারের সুনজরোর কারণে মেয়েরা বিভিন্ন পেশা স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে সেদিকে খেয়াল রেখে ডিজিটাল লাইব্রেরিতে শুরু হয়েছে বিনামূল্যে ভিডিও প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা ছেলে-মেয়ে উভয়কেই প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

এভাবেই আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরি ও ডিজিটাল লাইব্রেরি উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এ লাইব্রেরির উন্নয়নের সফলতা কামনা করি আমি।

লেখক: কো-অর্ডিনেটর, আমীর আলী খান পাবলিক লাইব্রেরি, বরিশাল

অভিজ্ঞতা নুসরাত জামিল মুনিসা

ত্রিশ সেপ্টেম্বর, তার ঠিক দু'দিন আগে অর্ধাং ২৮ সেপ্টেম্বর আশু আমাকে বললেন— তোমার বিচারক হতে হবে, পারবে? এমনভাবে বলেছে যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে, প্রতিদিন আশু রান্না করতে গেলে যেমন লবণ হয়েছে কিনা, নাস্তা বানাতে গেলে মিষ্টি ঠিক হয়েছে কিনা/বাল ঠিক আছে কিনা এগুলো বিচক্ষণতার সঙ্গে দেখে দেই। তো এটা আর এমন কি? এটা তো নিয়ন্ত্রিত মজার ও সাধারণ ব্যাপার। আমি এক কথায় বলে ফেললাম, এ আর এমন কি! সবসময় না হলেও বেশিরভাগ সময়ইতো পাস করি। আমার এরকম উভয় শুনে আশু বললেন যে, ‘এবারে আমার নয় তোমার ছেট ছেট ভাই-বোনদের নিয়ে একটি হাতের লেখা প্রতিযোগীতা হবে যার নাম ‘ছেট সোনামণিদের হাতের লেখা প্রতিযোগীতা’। তাই বিচারক হতে হবে। আমি একথা শুনে চমকে উঠে বললাম, ‘এটা তো কঠিন কাজ। কিভাবে পারবো আমি?’ আশু বললেন, ‘তুমই পারবে।’ এমনভাবে বললেন যে, মনে হয় আমি একজন বিজয়ী বিচারক।

যথারীতি ৩০ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরিতে উপস্থিত হলাম। যাই হোক, যথাসময়ের আগেই ছেট সোনামণিদের আগমনে লাইব্রেরিটি মুখরিত হয়ে উঠলো। সবাই বেশ পরিপাটি ও টেনশনে আছে। উপস্থিতি আয়োজকবৃন্দ এবং অন্য বিচারকরা দেখলাম বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের স্বাভাবিক রাখাৰ চেষ্টা করছেন। শুরু করলাম আমিও তাদের সঙ্গে দু'টি কথা বলা, ঠিকঠাক মতো চেয়ার টেবিলে বসিয়ে দেয়া, এইতো পেরেছি, আমি পারবো। সবাই খুব মনোযোগের সঙ্গে লিখছে।

এবার এক ঘন্টার প্রতিযোগীতা শেষ। এখন সময় হাতের লেখা বিচার বিশ্লেষণ করা। বিচারক হিসেবে শুধু আমি একা ছিলাম না। আমার সঙ্গে ছিলেন ঝর্ণা আন্তি। চিন্তা করলাম কিভাবে নম্বর দেবে? কি কি বিষয় ভুল হয়েছে তা দেখবো। সাধারণত বানান, মার্জিন এগুলো দেখা হয়। ভাবলাম শুধু এটুকু দেখলে তো সবাই প্রথম, কিন্তু এটা তো হবে না। মনে পড়লো ছেটবেলার শেফালি ম্যাডামের কথা, যার কাছে আমার হাতেখড়ি। প্রতিদিন হাতের লেখা লিখে নিতাম সুন্দর করে তারপরও তাদের কোনো না কোনো ভুল ধৰাই চাই। তার সেই ভুল ধৰাটাই আজ আমার পথের পাথেয় হয়ে গেল। কৃতজ্ঞ তাদের কাছে আজ। আমার ভুল ধৰায় সঠিক শিখতে পেরেছি বলে আমি আজ ছেট বিচারক হতে পেরেছি।

তারপর ঝর্ণা আন্তি ও আমার বিচারে সেদিন প্রথম হয়েছিল তাইয়েবো তুবা। ও ছিল বটতলা ওমর শাহ মদ্রাসার ছাত্রী। এটা আমার জীবনের একটি বড় অভিজ্ঞতা। এরকম আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনেক ধন্যবাদের পাশাপাশি দোয়া চাই এরকম প্ল্যাটফর্মে যেন আবার আসতে পারি।

লেখক: বিবিএ (২য় বর্ষ শিক্ষার্থী), সরকারি বি এম কলেজ, বরিশাল

জীবন ও সমান হোসনে আরা ইদ্রিস

শুরুতেই অনেকে ভাবতে পারেন এ আবার কেমন কথা। জীবন মানে বেঁচে থাকা আর সমান মানে কাজের ও বয়সের মর্যাদা। আসলে একটু ভেবে দেখুন মর্যাদাবিহীন জীবন কি আমরা কেউ চাই? মর্যাদা আসে সমানের মাধ্যমে। তাই ওই দু'টি জিনিস ওত্প্রোতুলভাবে একটি আর একটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

বর্তমানে ডিজিটাল যুগে মর্যাদা বা সমান মোবাইল বা কম্পিউটার বোতাম চাপলেই অনেক সুন্দর সুন্দর কথা ক্রিনে ভেসে ওঠে যেমন- I love you, I miss you, take my salam, greetings, bless, sorry ইত্যাদি। তাতে কি হলো মনের গভীরের খোঁজ এসে আমরা লিখিনা বা S.M.S করি না। জীবনের ভালোবাসা আর অনুভূতিগুলো দিনে দিনে যাস্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। বছর দশকে আগে নারী অসমানিত কিংবা নির্যাতিত স্বামী, শাঙ্গটী, নন্দ ইত্যাদি দ্বারা কিন্তু বর্তমানে দুঃখজনক হলেও নারী নির্যাতিত হচ্ছে সন্তানের দ্বারা। অনেকেই আবাক হবেন কিংবা নিজের মনকে সাঙ্গুনি দেওয়ার জন্য বলবেন না তাই আমার সন্তান খুব ভালো।

কখনও কি ভেবে দেখেছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য আচার-আচারণের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তার কারণ সন্তান জন্মগতভাবে কিছুটা স্বার্থপূর্ব। লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই, সন্তান যা চাইবে দিতে পারলে আপনি ভালো, না দিতে পারলে আচরণ বদলে যাবে। পিতা-মাতা কিন্তু সন্তানের কাছে কিছু চায় না। সন্তান সর্বজন তাই সন্তানদের জন্য উপদেশ বাণী দিয়েছেন।

জীবনকে যদি ৩টি স্তরে ভাগ করা যায়—শৈশব, যৌবন ও বৃদ্ধকাল। শৈশব কাটে পিতামাতার আদর-যত্নে-শাসনে ভালো-মন্দ মিলে। পুরুষ সব সময় স্বাধীন, সারা পৃথিবীত নারীর যুদ্ধক্ষেত্রে, বৃদ্ধকালে সন্তানের উপর কিছুটা নির্ভর করতে হয়। অর্থিক স্বাচ্ছন্দ থাকলে কঠিন করতে হয়ে যাবে। শারীরিকভাবে নির্ভর কিছুটা থেকেই যাবে। যাদের দু'টি সমস্যাই থাকে তাদের হেনস্টা হতে হবে ততোধিক।

একটা জীবন প্রথম অংশ সন্তানের জন্য প্রতিটি বাবা-মা

জীবনকে বাজি রেখে চলে। সেই বাবা-মা মধ্যবয়স থেকে যদি আর্থিক স্বচ্ছতা না থাকে তবেই শুরু হয়ে যায় অবহেলা। কথায়-কাজে-আচারণে জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। ভেবেও দেখে না। এই বাবা-মা নিজেকে সব দিক দিয়ে বাস্তিত করে শুধু সন্তানের খুশি-মঙ্গল কামনা করেছে।

সময় এসেছে সন্তানদের জন্য সময় বের করে ঘরোয়া বৈঠক আলোচনা, পারিবারিক ইতিহাস আদর-যত্ন, সমান দেয়া-নেয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা। ছেটবেলায় সন্তানরা ভাবে বাবা-মা'র কোনো চাহিদা নেই, কষ্ট নেই—তাই তারা সবসময় তাদের চাহিদাগুলোকেই শুরুত্ব দিয়ে যায়। যে পরিবারে আদব-কায়দা, কুশলবৰ্তী বিনিময়ের মাধ্যমে পারিবারিক আন্তরিকতা ও যোগাযোগ যত বেশি হবে তাদের কষ্ট ও অসমান তত কম হবে। সন্তানকে বুঝতে হবে কিভাবে আচরণ করতে হয় কট্টুকু চাহিদা রাখতে হয়। তাহলে তাদের মধ্যে বোার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। আমার নাতনীকে দোকানে নিয়ে আওয়ার আগে বলতাম— ‘দেখবে সব কিনবে একটি যা নেই।’ ও দোকানে গিয়ে এটা নিজের জন্য বলতো। দোকানদার বলতো ভারী সুন্দর কথা, তখন ও বলতো আমার নানু শিখিয়েছে।

জীবন অনেক কঠিন আবার চাইলে অনেক সহজ করা যায়। সন্তানদের সঙ্গে সহজ-সরল আচরণ করতে হবে যাতে সে সালাম সহকারে বিশ্বাস করতে পারে পিতা-মাতাদের। সব কথা বলতে পারবে, ভালো-মন্দ বুঝতে শিখবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে। সন্তানের মঙ্গল কামনা করে শাসন-আদর সমতা রাখতে হবে। যাতে ওরা অসমান করা বা বেয়াদিব করার সুযোগ না পায়। মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রথমে নিজের ব্যক্তিগুলকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো না। সকল সন্তান থাকুক দুধে-ভাতে। পিতা-মাতা থাকুক সসমানে।

লেখক: অধ্যাপক (অব.) ঢাকা টাইমেন কলেজ অ্যাড ইউনিভার্সিটি ও পাস্ট প্রেসিডেন্ট (পিপি), আন্তর্জাতিক জোন্টা ক্লাব

স্মৃতিকথা | লিয়াকত আলী খান

আমার বয়স এখন আশি বছর। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিবর্ণ সময় কাটাই। এরকম এক অলস সময়ে নাতনি মুনিসা একটা ভালো লাগার মতো খবর নিয়ে হাজির হলো আমার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে। মুনিসা বলল, ‘দাদু, আমীর আলী খান স্মৃতি লাইব্রেরি থেকে প্রথমবারের মতো একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে হচ্ছে। পত্রিকার জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। তোমার জীবনে তো ঘটনাবহুল ঘটনার পাহাড় জমে আছে। দো ও না একটা লেখা, ছাপিয়ে দেই পত্রিকায়?’ মুনিসার কথা বলার ভঙ্গি আর আগ্রহ দেখে আমার নিজের জীবনের স্মৃতিচারণের ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যেই যৌবনের টগবগে রঙিন দিনগুলো চোখের সামনে একেবারে জীবন্ত দেখতে পেলাম। অনেক ভাই-বোনের মধ্যে সবার চোখে আমি ছিলাম হ্যান্ডসাম। জীবনটা ছিল প্রজাপতির রঙিন পাখ



আ মা র জী বনে র গ ছল

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

আমার শুণুর মরহুম আমীর আলী খান পেরস্পর বন্ধু ছিলেন। সেই সময়ের অন্ত বয়সে বিয়ে দেয়া ছিল সামাজিক নিয়ম। আমার স্বামী মো. এনায়েত হোসেন খান একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তবে তিনি ব্যবসা ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে চাকরি শুরু করলে আমরাও সেখানে চলে থাই। এর মধ্যে আমার কোলজুড়ে আসে বড় ছেলে মো. লুৎফুল হোসেন খান এবং মেয়ে নুসরাত জাহান লিরা।

কিন্তু বেশিদিন আর নারায়ণগঞ্জে থাকা হলো না। শুশুর আবর্তনে
মারা যাওয়ার পরে ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে
আমার স্বামী চাকরি ছেড়ে বরিশালের বিরাট পরিবারের দায়িত্ব
গ্রহণ করেন এবং আমি সংসারের হাল ধরি। আমার শাশুড়ি
আগেই মারা যাওয়ায় সংসারের পুরো দায়িত্ব আমাকেই কাঁওঁ
নিতে হয়। রাজাঘর সামলানো থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজনের
মেহমানদারি এবং মসজিদে প্রতিবছরের ইফতারি বানিয়ে দেয়া।
মতো কঠিন দায়িত্বের বেঢ়াজালে আমি আবদ্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু
এত স্বপ্নের মধ্যেও আমার শখের কাজগুলো কথনেই ছেড়ে
দেইনি। সেলাই, আচার বানানো, নতুন রাজাবাজার রেসিপিশন
ইত্যাদি সমান তালে চালিয়ে গেছি। যৌথ পরিবারের সবাঁর
আমাকে সব সময় উৎসাহ দিয়ে সাহস যোগাতেন। আমার স্বামীর
উৎসাহে কথনে ভাট্টা দেখিনি। একদিন তিনি এসে বললেন, ‘স
কাজই তো পারো! উলের কাজটাও
ধরো। এই বলে উলের কঁটা আমার
হাতে ধরিয়ে দিলেন। সেই থেকে উল
দিয়ে সোয়েটার, মাফলার, টুপি, এমবিকি
জামা বানানোর পাক্কা কারিগর বনে
গেলাম আমি। বলতে বাধা নাই, আমি
অনেককে উলের কাজ শিখিয়েছি। সবার
ভালোবাসা এবং সহযোগিতায় আমি
সংসারে সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে গেলাম!
আল্লাহর অশেষ রহমত আমার সঙ্গে সব
সময়ই আছে। তাই এতসব দায়িত্ব

ପାଳନେର ପରେଓ ମନେ ହତୋ ଆମାର ଜ୍ଞାନ ସଦି ସବାର ମଧ୍ୟେ ଛଡ଼ିଲେ
ଦିତେ ପାରତାମ ତାହଲେ ଆରୋ ଭାଲୋ ଲାଗତୋ ।

একদিন সে সুযোগ এসে গেল! পত্রিকার পাতায় আমার চোখ
আটকে গেল। একটি আচার প্রতিযোগিতা হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঠিব
করলাম এই প্রতিযোগিতায় আমি অংশ নেব। যথারীতি আচার
প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আমি বিজয়ী হলাম। এই আমার প্রথম
বিজয়। এরপর আর থেমে থাকিনি। সংসারের কাজের ফাঁকে
ফাঁকে আচার প্রতিযোগিতা, রান্না প্রতিযোগিতা, পিঠ
প্রতিযোগিতায় আমি নিয়মিত অশ্বশৃঙ্খল করে পেয়েছি সামাজিক
স্বীকৃতি ও সাফল্য। এ সাফল্যের কাহিনী সবাই কমবেশি জানলেও
আজ এখানে লেখার লোভ সামলাতে পারছি না।

২০০৩ ও ২০০৮ সালে প্রাণ আরএফএল আচার প্রতিযোগিতায় জাতীয়ভাবে দু'বার প্রথম পুরস্কার এবং ২০০৫ সালে দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করেছি। রূপচাঁদা রান্না প্রতিযোগিতায় আঞ্চলিকভাবে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছি। মোজো পিঠা উৎসবে প্রথম পুরস্কার এবং রাঁধুনি রান্না প্রতিযোগিতায় সেরা ৫ জনের মধ্যে আমার অবস্থান ছিল। তাছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠান এধরনের বড় বড় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছে। আমার জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা আপনাদের না বললেই নয়। ১৯৭৪ সালে আমার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করার একটা সুযোগ এসেছিল। এ সুযোগটা এসেছিল আমার বিয়ের পর পরই। কিন্তু সে সময়ের সমাজ এখনকার সমাজের

চেয়ে অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিল। সমাজে ঘেরেদের ঘরের
বাইরে গিয়ে চাকরি করার বিষয়টি তেমনভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না
ঘর সংস্থারে কাজ করার মধ্যেই নারী আবদ্ধ থাকবে এবং সংস্থারই
নারীর জন্য সবচেয়ে বড় কর্মক্ষেত্র। মৌখিক ও ধনাট্য পরিবারের বড়
বৌ চাকরি করবে— এমনটি হতে পারে না। তাই আমি আর
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারলাম না!

ମନେର କୋଣେ ଏକଟୁ ସ୍ଵପ୍ନ ଛିଲ ଚାକରିର ପାଶାପାଶି ପଡ଼ାଶୋନା ଶୁରୁ କରବ । ମେ ସ୍ଵପ୍ନଟାଓ ଭେଦେ ଗେଲ । ତବେ ବଲତେ ବାଧା ନେଇ ଯେ, ଆମି ଏ ପରିବାରେର ମେଯେଦେର ପଡ଼ାଶୋନାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଆମାର ଶ୍ଵଶୁରେର ଏକାନ୍ତିକ ଚେଷ୍ଟା ଅବଳୋକନ କରେଛି । ଆମାର ଫୁଫୁ ଶାଶ୍ଵତିରା ଘୋଡ଼ାର ଗାଡ଼ିତେ କରେ ତଥନକାର ଦିନେ ବରିଶାଳ ସରକାରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିର ସ୍କୁଲେ ପଡ଼ାଶୋନା କରେଛେ । ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ କରାର ପରେ ଅନେକେ ତାଦେର ଦେଖିତେ ଏସେହେଲ । ବାଡିର ସାମନେ ମସଜିଦ ଥାକ୍କାଯ ଆମାର ନନ୍ଦରା ରିକଶ୍ୟା ଗାମଛା ପେଂଚିଯେ ପର୍ଦା ରଙ୍ଗା କରେ ସ୍କୁଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମାର ତିନ ଜା' ଚାକରି କରେଛେ । ତାଦେର ଚାକରିତେ ସାଫଲ ଏସେହେ । କାରଣ, ଆମାର ଭାସୁର ଏବଂ ଦେବର ତ୍ରୀଦେର ନେପଥ୍ୟେ ଥେବେ ସାପୋଟ୍ ଦିଯେ ଗେଛେ । ସମୟେର ସଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚ ଦିଯେ ସବକିଛୁଟୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେୟେଛେ । ତାଇ ଆମି ଚାକରି କରତେ ନା ପାରଲେଓ ଆମି ଦେଖେଛି, ଏହି ପରିବାରେ ନାରୀକେ କଥନୌଇ ଶୃଜନିତ କରା ହୟନି

তাদের প্রতিভা বিকাশের সব ধরনের সুযোগ অবারিত ছিল এবং আছে।

ডানো (তৃতীয়) সম্মানিত
গবর্নেণ্ট লুৎফুন নাহার

মেধার ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। তবে এই মেধা ও যোগ্যতা
ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উপ্রতা, অশালীনতা এবং ধর্মীয় অনুশাসনের
ব্যতিক্রম করা উচিত নয়। জীবনে আরও একবার প্রাণ
আরএফএল কোম্পানির কাছ থেকে ডিলারশিপের অফার পেয়েও
গ্রহণ করতে পারিনি। এজন্য মাঝেমধ্যে আফসোস হলেও
পরমুহুর্তে আর আফসোস থাকে না। কারণ, জীবনে অনেক
পেয়েছি। যখন দেখি ইউনিভারের ‘সাদা মনের মানুষ’-এর
নমিনেশনের তালিকায় আমার নামটিও আছে, তখন মনে হয় এ
জীবন সার্থক! আমার স্বপ্ন এখন একটিই। তা হলো, সত্যিকার
অর্থেই আমি যেন সবার কাছে একজন সাদা মনের মানুষ হয়ে
উঠতে পারি। জীবনে এর চেয়ে বড় প্রাণি আর কি হতে পারে!

অনলাইনের ‘নাহার ফুডস’ আমার বর্তমান বিজনেস। ‘আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরি’র অধি একজন উপদেষ্টা এবং মহিলা কমিটির সভাপতি। বিভিন্ন প্রশিক্ষণে আমি অংশগ্রহণ করে নিজেকে এখনো সক্রিয় রেখেছি। আমার কর্মের নেটওয়ার্ক প্রসারিত হতে হতে এখন আমি একজন সফল উদ্যোক্তা হিসাবে সবার কাছে পরিচিত।

সবশেষে, আমি পরিত্নু হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্বামী
সন্তান, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী, পাড়া-প্রতিবেশীদের
যাদের মায়া-মর্মতা ও ভালোবাসায় আমার জীবন আজ পরিপূর্ণ।

ଲେଖକ: ପ୍ରାଣ-ଆର୍ଦ୍ରଫ୍ରେଲ ଆଚାର ପ୍ରତିଯୋଗୀତାଯ ଦୁଃଖାନ୍ତ ପୂର୍ବକାରପ୍ରାଣ୍ତ ଏକଜନ ଗୃହିନୀ

ସ୍ମୃତି କ ଥ

হিসেবে কর্মরত। তিনি আমাকে দেখে তো বিস্ময়ে হতবাক। আমিও ভনিতা না করে ঘটনা খুলে বললাম। বড় ভাই বিচক্ষণ ও ধীরস্থির। চুপচাপ সব কথা শুনে সময় নিলেন। সাতদিন কেটে গেল। খাইদাই ঘূমাই। কিন্তু টেরে পেলাম অনেক সুমধুর কথা দিয়ে এই সাতদিনে ধীরে ধীরে আমার উত্তপ্ত ব্রেনকে একেবারে শীতল করার কাজ করছেন বড় ভাই। তাঁর কথার মূল সুর ছিল সরকারি চাকরি স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাওয়া নেহায়েত বোকামি হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুপ্রেরণায় রাজি হলাম শাহজিবাজারের কর্মসূলে ফিরে যেতে। কর্মসূলে পৌছে দাঁড়িয়েছি মাত্র। সবাই অবাক দৃষ্টিতে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের চাহনিতে শুধুই বিস্ময় ও আতঙ্কের ছায়া। আমি জঙ্গলে হারিয়ে গেলাম কিনা, আমাকে বাষে খেয়েছে কিনা এ ধরনের একটা সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। আমি বিব্রত। ঠিক এ সময় একজন পিয়ান এসে আমার হাতে একটি চিঠি দিয়ে দাঁড়িয়ে রাইল। চিঠিটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়া শুরু করলাম। চিঠিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কর্মসূল ত্যাগ করার জন্য আমার ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। কাউকে না বলে কর্মসূল অনুপস্থিতির অপরাধে কৈফিয়ত যাওয়া হয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে

আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরি



[প্রথম পৃষ্ঠার প

ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ সালে ইন্দোকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সুযোগ্য সন্তান এবং বহু গুণশাহী রেখে গেছেন।

মহান এই ব্যক্তি অগণিত মানুষের উপকারে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর নামেই এলাকার নামকরণ করা হয়েছে আমীর কুটির। তিনি এলাকার দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের চিকিৎসা, অর্পণ, বন্ত্র ও বাসন্তান্ত্রের জন্য আর্থিক সাহায্যের হাত প্রস্তাবিত করেছেন। ‘আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরি’ গঠনের মাধ্যমে শিক্ষামূলকাণ্ড এই মানুষটির অবদান স্মরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর স্মরণে বরিশালে বহুবুর্হী জনহিতকর কার্যক্রমের শুভ যাত্রা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে গৰীব, দুঃস্থ, অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে থাকে। ‘আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরি’র পাশাপাশি ‘আমীর আলী খান ডিজিটাল লাইব্রেরি’র কাজ পুরোনো শুরু হয়েছে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ‘আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরি’ এলাকায় ছেলেমেয়েদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

আসুন, আমরা আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক এবং ডিজিটাল লাইব্রেরি'র সকল সেবা গ্রহণ করি। এ লাইব্রেরির সেবাগ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। জ্ঞান অর্জনে পাঠকরা পাবেন নতুনত্ব, যা শিক্ষা বিষয়ে নতুন মাত্রা যোগ করবে। সঠিক ও সম্মত জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্রবিন্দি হবে এ লাইব্রেরি।

সুষ্ঠ ও সঠিক জানসম্মত জাতি গঠনে লাইব্রেরির ভূমিকা অপরিসীম। তাই প্রচলিত লাইব্রেরির ধারণাকে বদলে দিয়ে ‘আমীর আলী খান স্মৃতি পাবলিক লাইব্রেরি’র মতো একটি প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক লাইব্রেরি গঠনের মাধ্যমে প্রযুক্তিসহ বহুমুখী সেবা পাঠকের হাতে পৌছে দেয়ার অঙ্গীকার করি এবং তা বাস্তবায়নে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলি।

লেখক: অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক, মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ/
অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

স্বপ্নকন্যা

মাহ্মী সাইদ রিশাদ

আমার মনের সাদা মেঘে রং ছড়াবো তাই,
তোমার টেঁটের রঙিন হাসি ধার করিতে চাই ।
ধার করিলে কাজ হবে না মেঘগুলো খুব সাদা,
বং করিতে লাগবে আবও তোমার চালের গাঁদা ।

সাদা মেঘে বৃষ্টি নেই বৃষ্টি লাগে ভালো,
দারুণ হতো দিতে যদি তোমার ছুলের কালো ।
তোমার চোখের পাপড়ি নিয়ে গড়বো নকশা তুলি,
মনের মেঘে একে নেবো স্বপ্ন ইন্দুপ্রাণী ।

চেহারাটি মিষ্টি মধুর
গালে যেন কাঁচা সিঁদুর,
দেখতে নাহি পাই
কেশরাজি ঘোমটাসম, আড়াল করে তাই

কেশবাজি মেঘের বেশে চাঁদমুখটা রাখে ঢেকে,
স্বপ্নকন্যা তোমায় ছাড়া আর আমি চাইবো কাকে?
ওই ঠেঁটেরই পুষ্প খুলে কথা ভ্রম বেরিয়ে এলে,
কান পেতে বসে থাকি ভ্রমগুলো ধরবো বলে।

ପରେ ଭୁଲ ବୁଝାତେ ପାରି
ଅମର ନୟକୋ ପୁଷ୍ପ ଖୁଜି,
ତୋମାର ପୁଞ୍ଚବାଗାନଖାନି
ନିଜେର ଭାବରେ ଭାଲୋବାସି

সর্বক্ষণ থাকবে পাশে
বিপদ কিংবা সুখের মাঝে
ভাবি তোমার মতো এমন
এই ভুবনে কেউ কি আছে

গৈৰিক: অ্যাসুস্ট্ৰাট ম্যানেজাৰ
ব্র্যান্ড অ্যাব কমিউনিকেশন, সিটি ব্যাংক

শৃঙ্খলি বিজড়িত কমলা সার্কাস

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সন্ধ্যায় পাড়ার ছেলেমেয়েদের পড়ায় মন বসতো না। কখন যাবে কমলা সার্কাস দেখতে। সারা এলাকা অজন্তু লাইটের আলোতে ঝলমল। সানাই আর বিউগলের সুরে হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো বাচ্চদের মাঠে টানতে থাকত। অথচ পড়া শেষ না হলে গৃহশিক্ষকদের কাছ থেকে ছুটি পাওয়া ছিল দুর্ভু। এরপর আবার বাবা মার্স কাছে আবদর। কমলা সার্কাস, কমলা সুন্দরী! ও আল্লাহ, মানুষ দেখতে এত সুন্দর হয়! কমলা সুন্দরীর সাজসজ্জা আর সরু দড়ির উপর দিয়ে হাঁইহিল জুতা পরে ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটার স্টাইল দেখে আমরা সবাই মুঝ। আবার বৃহৎ গোলাকার খাঁচার মধ্যে সার্কাস পার্টির লোকদের দ্রুতবেগে হোস্তা চালানো দেখলে কার না মাথা ঘুরে যায়! এরপর ক্লাউন বা ভাঁড়দের আকর্ষণীয় সাজসজ্জায় সবাই ছিল বিমোহিত। হাতি আর ঘোড়ার বিভিন্ন খেলার নেপুণ্য, বানরের দড়ি বোলার কায়দা, কোনটা রেখে কোনটা দেখবে দর্শক!

কমলা সার্কাস চলাকালে রাতে পড়ার ঘুরবক ছেলেরা বাসায় ঘুমাতো না। রাতভর সার্কাস দেখে পরেশ সাগরের মাঠে চাদর বিছিয়ে, মশারি খাটিয়ে ঘুমাতো। সাগরের মতো দেখতে বড় পুরুষটিকে সবাই বলতো— পরেশ সাগর। মধ্যম বয়সের পুরুষেরা বিকেলে এ পুরুষটিতে হুইল বড়শি দিয়ে মাছ ধরতো। সার্কাসের সিজনে স্কুলের বাচ্চদের পড়া আদায় করা টিচারদের জন্য সহজ ছিল না। ক্লাসে শিক্ষকদের প্রশ্ন— ‘কাল রাতে কে কে গিয়েছিলি সার্কাস দেখতে? হাত তোল’ একটি হাতও উঠতো না উপরে। টিচারার বলতেন, ‘গুড়। ওসব সার্কাস টার্কাস দেখতে হয় না। ওখানে শেখার কিছুই নেই। কেবল জাদু। তার চেয়ে ঘরে বসে লুভু খেলবি, বুবালি?’ অথচ ওই মাস্টাররাই কিন্তু টিকেট কেটে সার্কাসের সামনের সারিতে আগোই বসে থাকতেন। আর ছাত্রার পিছনের সারিতে মুখ ঢেকে বসতো। হাতি ঘোড়ার চেয়ে কমলা সুন্দরীকে দেখার জন্য সবাই পাগল ছিল। পুরু এক মাস চলতো এ সার্কাস। গ্রামগঞ্জ থেকে আল্লায়-স্বজন সব শহরে চলে আসতো এ সার্কাস দেখতে। হোটেলগুলো ছিল ভরপুর। ব্যবসাই ব্যবসা। সারা শহর কমলা সার্কাসের পোস্টারে ছেয়ে যেত। মাস শেষে বিদায়ের পালা। আন্তে আন্তে লাল কমলা রংয়ের বেষ্টনির কাপড়গুলো খুলে ফেলা হতো। খুঁটিগুলো উপড়ানো। অজন্তু ছেঁড়া কাগজ, চিনে বাদামের খোসা, আইসক্রিমের কাষি, বিড়ি-সিগারেটের ক্ষয়িয়ত টুকরা, আর অন্যান্য বর্জন মাঠটি অসম্ভব নোংরা থাকতো। আনন্দার ক্যাম্পের চুলোর পোড়া ইট, পোড়া লাকড়ি, খালি মসলার টিন, ভাঙ্গা সাজি আর খালি তেলের ক্যানে কেবলই বিদায়ের করণ সুর বাজতো। আমাদের সবার মনে যেন শোকের ছায়া বিরাজ করতো। পরেশ সাগরের মাটি দেখলে তখন মনে হতো:

খেলা করে চলে যায় খেলিবার সাথী
কত আশা কত যাওয়া এ ধরাতলে,
রাখে না কেহই তারে মনে।

লেখক: সাবেক বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক



মধ্যম বন্ধুত্ব

জামাতুল ফেরদৌস ফারিহা

ছোটবেলা থেকেই স্কুলে যাওয়ার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল আমার। কিন্তু রাগাটেন স্কুলের পাশেই বাসা হওয়ায় জানালা দিয়ে দেখতাম ছেলেমেয়েরা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। আমার বয়স তখন আড়াই কিংবা তিনিশ ছিল। একদিন আমিও বায়না ধরলাম আমি এখনই স্কুলে ভর্তি হোৰে, ওদের মতো আমিও নীল ক্ষার্ট পড়াৰো (স্কুলের ড্রেস তখন সাদা সার্ট আৰ নীল ক্ষার্ট ছিল)। আবু পৱিদিন গিয়েই প্রিসিপ্যাল স্যারের সঙ্গে কথা বলে আমার ভর্তি নিশ্চিত কৱলেন। সকাল ৭:০০ টা থেকে স্কুল, সারাবাত ঘুমোতোই পারিনি, কখন সকাল হবে আৰ কখন আমি স্কুলে যাব! এটা ভাবতে ভাবতেই স্কুল হয়ে গেল। আমু আমাকে রেতি কৱে দিলেন। এখন আমি আবুৰ সঙ্গে স্কুলে যাব। খুব তাড়াহুড়ো কৱছি আমি। কারণ, স্কুলের প্রথম বেঞ্চটা আমার লাগবেই। গিয়ে দেখি কেউ আসেনি এখনো কিন্তু প্রথম বেঞ্চটা একটা ব্যাগ রাখা। মন খারাপ হয়ে গেছে আমার, আশেপাশে খুঁজছি কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। মনমোহন হয়েই দ্বিতীয় বেঞ্চটায় গিয়ে বসলাম। আবু আমাকে দিয়ে অফিসে চলে গেলেন। ধীৰে ধীৰে সবাই আসতে শুর কৱলো। কিন্তু প্রথম বেঞ্চের মেয়েটা আর আসে না। ইতোমধ্যে ক্লাসের শিক্ষকও

চলে এলেন। হঠাৎ শুনলাম একটি মেয়ে বললো, “স্যার আসতে পারিব?”

স্যার বললেন, “এসো।” মেয়েটা এসেই প্রথম বেঞ্চটায় বসলো। মেয়েটার নাম সানজানা। খুব রাগ হচ্ছিল তাকে দেখে, কিন্তু প্রকাশ কৱলাম না। ক্লাসে মনোযোগ দিলাম। স্যার আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় কৱিয়ে দিলেন। স্কুল ছুটির শেষে বাসায় ফিরলাম আমুৰ সঙ্গে। অতঃপর আমুকে সব ঘটনা বললাম। পৱিদিন ছিল মাসের ১ তারিখ। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটিয়া এসেছে। দুটি ছেলে-মেয়েকে দেখলাম, আৰে মেয়েটা তো সানজানা। কোনো কথা না বলে বাসার ভিতৰে চলে এলাম। পৱিদিন সকালে লক্ষ কৱলাম, মেয়েটার দাদি ভোরবেলায় একটা ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। একটু পরে মেয়েটাৰ দাদি ব্যাগ ছাড়াই বাসায় চলে এলেন। তখন বুবাতে পারলাম যে, আগে থেকে সিট রেখে আসা হয়, মেয়েটা পরে স্কুলে আসে। এরপর থেকে আমিও বায়না ধরলাম, আমিও এমন সিট রাখবো, আবুকে বলা শুরু কৱলাম, তুমিও আগে গিয়ে আমার জন্য ওই ফার্স্ট বেঞ্চে ব্যাগ রেখে আসবে। একমাত্র ছোট মেয়ে আমি, কোনো আবদারই আবু ফেলতে পারতেন না। আমার জন্য আবু সকালবেলায় উঠে ফজরের নামাজ পড়েই ব্যাগ নিয়ে স্কুলে চলে যেতেন সিট রাখাৰ জন্য। এরপর অনেকদিনই অমি ফার্স্ট বেঞ্চে বসতে পেরেছিলাম। কিছুদিন যাওয়াৰ পৰি সানজানা আমার সঙ্গে কথা বলতে এলো। ধীৱে ধীৱে ওৱা সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে উঠলো। আৰ পাশের ফ্ল্যাটে থাকাৰ দৱল বন্ধুত্ব অনেক গভীৰ হয়ে গেল। বলতে গেলে আমোৰ সারাদিনই একসঙ্গে কাটাই। এখন আৰ সিট রাখাৰ জন্য আমার আবু কিংবা ওৱা দাদিকে যেতে হয় না। একদিন ও সামনেৰ বেঞ্চে আৱেকদিন আমি, এভাবেই বসতাম। আৰ এভাবেই গড়ে উঠলো— ‘সাঞ্জু-ফারিহা’ বন্ধুত্ব।

লেখক: এম.এস শিক্ষকীয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৩ ঘণ্টার ঘড়ি

শ্রীফ তাহমিদ-উল ইসলাম

কী এক বামেলার মধ্যে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল রাজন। সে এখন একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে একটি মার্জারের কেস কভার কৱতে যাচ্ছে। রাস্তা খুব ভাঙা, ঘন কুয়াশা ও আশেপাশে গভীৰ জঙ্গলে ভৱা। তাৰপৰ প্রায় দুই কিংবা ২:৩০ টায় দুটি বাড়িৰ সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রথম বেঞ্চটায় সব জানালা কপাট তজ্জ দিয়ে সেঁটে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বাড়িটিতে সবকিছু খোলা। সব যেন ভেঙে ফেলা হয়েছে। রাজন ভাবলো, যেহেতু গভীৰ রাত, তাই সে তজ্জ মার্জা বাড়িটার দৱজার সামনে গিয়ে দেখে দৱজার তালা ভাঙা অবস্থায় আছে। কিন্তু এতকিছু না ভেবে ও সেই ছিটকিনি খুলে ভেতৰে গেল। ও দেখলো সবকিছু ময়লা ধুলোয় ভৱা। তাৰপৰ দ্বিতীয় তলায় চলে গেল। উপরে গিয়ে দেখে সবকটা কৰ্ম তালাবন্ধ। তবে একটিতে তালা লাগানো ছিল না। ও সেটাৰ ছিটকিনি খুলে তুকে দেখলো একটি বেডৰুম। তবে আশ্চৰ্যের ব্যাপার হলো, সেখানে কোনো ধুলা-ময়লা ছিল না। কিন্তু এতো কিছু ভাবাৰ জন্য শক্তি ছিল না রাজনেৰ। ওখানে থাকা একটি বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমালোৰ আগে ওখানে একটি ঘড়ি দেখতে পেল। তবে ওটাতে এত মনোযোগ দেয়াৰ শক্তি ছিল না। সকালে ও বাড়িটি থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য বাড়িটিতে তুলোশি কৱলো। কিছু না পেয়ে সে আশেপাশে ঘোৱাঘুৰি কৱেও কিছু পেল না। তবে একটি টং দোকান দেখতে পেয়ে সেখানে ও নাস্তা কৱলো। দোকানদার লোকটি বললো, ‘বাছা এইখান থেইকো চিলা যাও। এহানে অনেক বিপদ হবে তুমার।’ চাচা আমি একজন ডিটকেটিভ। আমি এখানে একটি খুনেৰ কেস কভার কৱতে এসেছি, রাজন বললো। চা-ওয়ালা বললো, ‘সাবধান! এখানে অনেক বামেলা আছে। ফিরা যাও।’ রাজন পাতা দিল না ওই কথাগুলোতে। কিন্তু ও জানে না যে, ও নিজেকে কত বড় বিপদের মধ্যে ফেললে। ও রাতে সেই বাড়িতে যায় প্রায় ১২:৪৫ এৰ দিকে। অনেক ঘোৱাঘুৰি কৱেছে ও রাতে রাতে কেসে কেসে কৱেছে। তবু রাজন শুয়ে পড়লো। শুয়ে দেখে যে ঘড়িটায় ১৩ ঘণ্টা আছে। তবে এমন না যে ১৩ টায় পৱে ১ নেই। ১৩ টায় পৱের ঘণ্টা ১ টা। ও অনেকটা ভয় পাইয়ে গেলে জানি। কিন্তু যখন ১৩ টা বাজে, সে তাৰ জীবনেৰ শেষ সময় পোরিয়েছে। হঠাৎ মনে হলো ওৱা শৱীৰটা একটা অশৰীৰী শক্তি দ্বাৰা আৰ্কৰিষ্ট হচ্ছে। অনেক চিত্ৰকাৰ কৱার চেষ্টা কৱলোৰে মাত্ৰ দিয়ে কোনো কথা বেৱলো না ওই। এক সংগৃহ পৱে, ‘এই তোৱা কেউ রাজনেৰ কোনো খবৰ পেয়েছিস?’— জিজোসা কৱলো এফবিআই-এৰ প্ৰধান আমিন।

লেখক: এসএসসি পৱীক্ষার্থী

অত্মপ্রত হৃদয়ের কানা

নাজনীন হোসেন

গৱীৰকে দান কৱতে
হিসেব কৱি বারবাৰ।
হোটেলে টিপস দিতে
প্ৰকাশ কৱি নিজেৰ অহংকাৰ।
ব্যাকেৰ টাকাৰ হিসাৰ গণনা কৱি
প্ৰতিদিন দুই দুইবাৰ,
যাকাতেৰ হিসাৰ কৱি না বছৰে একবাৰ।
আলমাৰিৰ তাকণগুলো অব্যবহৃত
দামি কাপড়ে বোঝাই,
মন কেন খুশি হয় না গৱীৰ
মা-বাবাৰ কিশোৱাৰ কল্যাকে
দুটি সুন্দৰ কাপড় দিয়ে সাজাই।
শোকাতুৰ হৃদয় নিয়ে,
আপনজনকে কৱৈ রেখে আসি
তিনিদিন পৰি তাও হয়ে যায় বাসি।
হৃদয়েৰ আকাঙ্ক্ষায় অৰ্ধেৰ বাহুল্যে
গড়ে তুলি বিলাসবহুল ইমারত,
তাকৈয়ে দেখিন কৱত মানুষেৰ জীবনটাই হলো রাস্তাৰ ফুটপাথ
ভাৰি না একবাৰও পৱকালে
দিতে হবে এৰ খেৱারত,
জীবনেৰ শেষ প্ৰান্তে এসে
এখন আমি ভাৰি,
হায় সারাটা জীবন কৱেছি শুধু
নফসেৰ গোলামী।
দেহ নামক বাহন্টাকে দিয়েছি খোৱাৰ কৱেছি কত যত,
ভূলে গেছি আসাৰ এ দেহেৰ
ভিতৰে যে রয়েছে,
অভুত এক রহ নামক রত্ব।

লেখক: যুক্তরাজ্য প্ৰবাসী ইসলামী চিন্তাবিদ